Vol : V Issue :VII,1st October, 2016 (Special Issue) PRABINBARTA RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

1st October 2016

Special Issue

Vol : V Issue :VII,1st October, 2016 আশ্বিন,১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

বেথুন ইন্সটিটিউট
অফ্
জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার - এর
বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন
(১৮৯০ - ১৯৩৯)

Vol : V Issue :VII,1st October, 2016 (special Issue) PRABINBARTA RNI NO. WBBEN / 2012 / 46375

।। সভাপতির বক্তব্য ।।

পেলব মুখার্জী

বন্ধুগণ,

'বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস' উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সকলে ভাল থাকুন।

সারা বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালন করার সাথে সাথে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী এই দিনটি উৎযাপন করে আসছি। দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ আমরা প্রবীণদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের লক্ষ্যে প্রচার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছরের মধ্যে আমরা সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমবেত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। .... সালে বহরমপুরে প্রবীণ নাগরিকদের সমবেত করে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতি হয়ে ওঠেনি। আমরা সকলকে সমবেত করার জন্য আমাদের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছি। প্রতিমাসে আমাদের মাসিক মুখপত্র 'প্রবীণবার্তা' পৌছে দেওয়ার কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের হলেও বলতে হচ্ছে, কোন আশানুরূপ অগ্রগতি আমরা ঘটাতে পারিনি।

বিগত বৎসরগুলির ন্যায় এ বৎসরও প্রবীণবার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় যে সকল সদস্য তাদের লেখা আমাদের দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমরা প্রতি বৎসরই আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ১৩ নং ওয়ার্ডে প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানিয়ে থাকি, গত বছরেরও বিক্রমগড় হরিসভা মাঠে এবং কর্টজুনগর কলোনী কমিটির সভাগৃহে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৯৯জন প্রবীণ ব্যক্তিদের আমরা সম্মানিত করেছি। এছাড়াও প্রতি বৎসর এই দিনেই সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে গুনীজনদের সম্বর্ধনা দিয়ে যাচ্ছি এবং এই বছর ব্যাঙ্ক আন্দোলনের নেতা শ্রী দেবেশ ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী সুবিমল সেন মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। এবছরও আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ (মঙ্গলবার) পোদ্দারনগরের গভঃ হাউজিং কমপ্লেক্স এ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭০ বছরের উর্দ্ধে ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য আমরা সচেষ্ট, সেই উদ্দেশ্যেই ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক বাঁশদ্রোণী রায় নগরস্থিত হরিদাস মালাকার ভবনে একটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা দান করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি, বিশেষ করে ফিজিওথেরাপি ইউনিট প্রতিষ্ঠান ও তার অগ্রগতির জন্য আমাদের সদস্য ও নাগরিকদের অসংখ্য দানের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। একাজে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশাকরি, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে অংশগ্রহণ আমাদের নতুন নতুন উৎসাহ বৃদ্ধি করছে। আশাকরি, আগামী দিনে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবো।

আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, সকলে সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন।

।। সুবিমল সেন ।।
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানের ঢাকায় ১৯৪২র অক্টোবর মাসে জন্ম। দেশভাগের পর এসেদে আগামন। ১৯৬৭ সালে ঢাকুরিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে Physics নিয়ে স্নাতক এবং একই বিষয় নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেস্নাতকোত্ত ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই পি.এইচ.ডি. করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গম এবং গ্রেট বৃটেনের Manchester University তে Post Doctoral Research সম্পন্ন করেন

তার কর্মজীবন শুরু Saha Institute of Nuclear Physics য় Faculty সভ্য হিসাবে ২০০২ সালে অবসরের পূর্বে তিনি Senior Professior এবং Nuclear Science এ প্রধা হিসাবে কাজ করেন।

১৯৯৬-২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি Govt of West Bengal, Deptt. of Scienc Technology and Non Conventional Energy এর সেক্রেটারি হিসাবে ডেপুটেশনে কর্মর ছিলেন।

এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স বিভাগে অতিথি অধ্যাপক দায়িত্ব পালন করেছেন।

অবসর গ্রহণের পর West Bengal State Council of Higher Education রVice Chairman এবং Chairman র গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া State Planning Board Govt.of West Bengal এর স্থায়ী সদস্য হিসাবেও তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন।

তাঁর অবসর জীবন অতিবাহিত হচ্ছে N.G.O দের মাধ্যমে সমাজ সেবায়। তাদের ম উল্লেখযোগ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ফোসেট প্রমুখ।

তাঁর মননশীলতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং মানবিকতায় আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। দেশে যখ ক্রমশই সাম্প্রদায়িকতা, অশিক্ষা, ও কুসংস্কারের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তখন শ্রীসেনের মানবিকতা 'সিক্ত যুক্ত-বৈজ্ঞানিক' চিন্তাধারার শিক্ষা আরো বেশী প্রয়োজন। তাই কামনা করি আগামী বহুদিন সু শরীরে আপনি শিক্ষক মহলে দায়িত্ব পালন করুন।

।। দেবেশ ভট্টাচার্য ।।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা

দেবেশবাবুর জন্ম ১৯৪০ সালে বর্ধমানের মন্তেসর গ্রামে। আদি বাড়ী হুগলীর গুপ্তিপাড়ায়। পিতা, নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য, সমাজসেবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, কর্মসূত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে কলেজ শিক্ষা বর্ধমান এবং চন্দননগরে। চাকুরী জীবন কাটিয়েছেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে, যেখানে তাঁর Trade Union - এর কার্যকলাপ শুরু, পরে বিস্তার পায় সারা ভারতবর্ষে। ডিসেম্বর ২০০২ এ অবসর গ্রহণের পূর্বে ছিলেন UBIOEA এবং All India BK, Officers' Association WB State Unit এর General Secretary এবং Working President I ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে নেতা হিসাবে পেনশন আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে AIBOA সর্বপ্রথম দ্বিতীয় সুবিধা হিসাবে পেনশনের দাবিই তোলে, দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৯৫ এর অক্টোবর মাসে ব্যাঙ্ক কর্মীদের সেই দাবী পূরণ হয়। ব্যাঙ্কে কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্মরণীয়। জাতীয় ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা বারে বারে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। অফিসার, সাধারণ কর্মচারী নির্বিশেষে বহু কর্মচারীর অন্যায় বরখাস্ত তিনি একক প্রচেষ্টায় রুখে দিয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর সারা ভারতবর্ষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মুহূর্তে তিনি UBI Retires' Welfare Association এবং Bengal Provisional Retired Bank Employees Association এর General Secretary এবং All India Bank Retired Fedaration এর Dy. Gen Secretary I ছিয়াত্তর অতিক্রান্ত বয়সেও অবসরপ্রাপ্ত এবং প্রবীণ কর্মচারীদের সামাজিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম অনুধাবনযোগ্য।

Trade Union কর্মকাণ্ডের আগে দেবেশবাবুর রাজনৈতিক আন্দোলন যেন প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো। ১৯৬৬ সালে তিনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। সেই সময় হুগলীর গ্রামাঞ্চলে সাঁওতাল, খেতমজুর এবং Marginal Farmer এর মজুরি বৃদ্ধি এবং জমি উদ্ধারে তাঁর ভূমিকা আমাদের স্মরণ আছে। তৎকালীন সামান্য ঋণের অজুহাতে 'সাফ-কবলা'র সাহায্যে সাঁওতাল / দরিদ্র কৃষকের জমি হস্তগত করতো। দেবেশবাবুর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন এই অবিচার অনেকটা বন্ধ করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে Trade Union র চাপে তিনি কৃষক আন্দোলন থেকে সরে এলেও মার্কসবাদী ভাবধারায় এবং চেতনায় আজও সমানভাবে বিশ্বাসী।

আমরা চাই তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরে সুস্থদেহে সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যান।

Vol : V Issue :VII,1st October, 2016 (Special Issue) PRABINBARTA RNI NO. WBBEN / 2012 /

।। সমাজে প্রবীণদের নিয়ে চিন্তাভাবনা ।।
ও
বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান

বিমল চ্যাটার্জী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, অকাল মৃত্যুর হ্
আবার গ্রামে গঞ্জে অর্থনৈতিক আচারে এবং শহর অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ও শিক্ষা প্রসারের ফলে জন্মহারও উল্লেখ
করছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীলদেশেও প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা আনুমানিক ৮ কোটি ২০
অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩২ কোটি ৭০ লক্ষে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, অকাল
হ্রাস পাওয়ায় দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করছে না। সুতরাং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি
মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন সমস্যা নয় — সমস্যাটি অন্যত্র।

ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বের ঐতিহ্য বহন করে। সেই ঐতিহ্যকে ঝেড়ে ফেলে নবীনরা
পাশ্চাত্য জীবন সৌরভের আকর্ষণে। যৌথ পরিবার ত্যাগ করে তারা ক্ষুদ্র সংসার গড়ে তোলাতেই আগ্রহী।
পরিবারের প্রধান সদস্য ও তার জীবন সঙ্গীকে দিন কাটাতে হয় একাকীত্বে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়
'বৃদ্ধাশ্রমে' পাঠিয়ে ছেলে মেয়েরা দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে চান। অথবা ছেলে, বৌমা ও নাতি নাতনি তাদের নি
করে জীবন চালায়। বাবা মা, দাদু ঠাকুমার সঙ্গে দুদন্ড কথা বলবার অবকাশ তাদের নেই। অফিস বা স্কুল কলেজ
যে যার মত ব্যস্ত। সেখানে শারীরিক বা মানসিক অবস্থা প্রকাশ করার ইচ্ছেটাই যায় হারিয়ে। প্রবীণরা সমাজ ও প
প্রায়শই পেয়ে থাকেন অনাদর, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা। সেই প্রবচন — 'মা ভাঙা পাথর বাটিটা ফেলে দিও না, তাহ
হলে তোমাকে খেতে দেব কিসে'। এটা মনে রাখতে হবে — কারণ জীবন প্রবাহ একইভাবে বার বার একই প
করে। প্রত্যেককেই একদিন না একদিন ঐ বয়সে আসতেই হবে যখন অপরের সাহায্য ছাড়া সামান্যতম কাজটি
পারবে না। আজকের শিশু কালকের পরিণত যুবক যুবতী এবং জীবন প্রবাহে একদিন সে হবে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। ব
নবীনদের দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা করে তাদের বোঝাতে হবে যে, বয়স্করাও সমাজের সাথে
জড়িয়ে আছেন। বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও উপযুক্ত গুরুত্ব এবং মানবিকতা দিয়ে তাদেরও সমাজ
পরিবারের মূল স্রোতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ নবীনদেরই দিতে হবে।

কর্মজগৎ থেকে অবসরপ্রাপ্ত, জীবনশক্তিতে দীর্ঘায়ু, আর্থিক বিচারে পরনির্ভরশীল, মানসিক চাপগ্রস্ত
এই বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধ মানুষ কিন্তু সমাজ সংসারে দেশের ও দশের সামগ্রিক শিক্ষা ও অর্থনীতি, রাজনীতিতে
বহন করে চলছে। তাই আজ মুখ্য প্রশ্ন উঠে আসে — কে বা কারা এই সর্বস্তরের প্রবীণ মানুষের সংগঠন ও র
দায়িত্ব নেবে? ভারতবাসীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত থেকে মুক্ত করতে হবে। যা কিছু তারা করেছেন,
ভবিষ্যৎ তৈরীর কথা ভেবেই করেছেন, নিজের বার্ধক্যের দিনগুলির কথা ভেবে নয়। তাই প্রবীণদের অভিজ্
সংসারে তাদের অবদান স্বীকার করে নিতে পারলেই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারবে এক অনিন্দসুন্দর স্বচ্ছ
জীবন। নতুন সভ্যতা ও নতুন সংস্কৃতি যা সর্বস্তরের মানুষের মনন জগতে আবার এক আনন্দধারার পরিবেশ

প্রবীণ এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠরাই তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে নবীনদের পথ দেখান। তাঁরাই দৃষ্টান্ত দিয়ে শেখান, সমাজের কাছে কোনটি ঠিক বা কোনটি বেঠিক, কোনটি গ্রহণযোগ্য বা কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোনটি সমাজের কাছে সভ্যতা আর কোনটি অসভ্যতা। তারা সমাজ ও পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। প্রবীণরা সমাজ ও পরিবারকে অনেক কিছু দিতে পারেন, তা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা ও মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারলে প্রবাহমান কালের গতির যে ক্ষতি হবে তার প্রতিক্রিয়া হবে সুদূর প্রসারী। বয়স্করা বোঝা নন, তারা সমাজের সম্পদ। প্রবীণরা বিশাল অভিজ্ঞতার আধার। আজ বেশীর ভাগ মানুষই এই মূল্যবোধ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছেন। প্রবীণদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে নবীনদের কাজে লাগাতে হবে আধুনিক সমাজ গঠনে।

ভারত সরকার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে তাদের শারীরিক পুনর্বাসনের জন্য। কিন্তু তাদের মানসিক পুনর্বাসনের কি হবে? প্রবীণদের প্রধান আশ্রয় স্থল হল পরিবার। ভারতীয় ঐতিহ্যের ও প্রবীণদের প্রতি মূল্যবোধের অনুসারী হয়ে নবীন প্রজন্মই একদিন প্রবীণ হবে, আর তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, প্রবীণদের মনে আশার আলো জ্বালাতে ও তাদের অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে।

এই সকল সমস্যা নিরসনে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধান সূত্র পেয়েছে বেথুন ইনস্টিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। তাই ইনস্টিটিউটের বহুবিধ কর্মধারার মধ্যে, নবীন প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত করার জন্য ৯৩ নং ওয়ার্ডের ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের নিয়ে দুদিনের কর্মশালার ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী। তাঁদের অতীতের অবদানের নিরিখে তাঁরা যে পরিবারের মূল্যবান সম্পদ, এসব ধারনাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাগ্রত করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য পূরণে আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য।

—

।। আত্মনের অনুপস্থিতি ।।

রামরমণ ভট্টাচার্য

বেথুনের মঞ্চের পিছনে অথবা তিনতলায় যাবার সিঁড়িতে বিমল চ্যাটার্জীর ছবিখানি আমরা সকলেই দেখে
নিয়মিত দেখছি। বিমলদার বাঁ- পা মাটিতে, ডান-পা তোলা সামনে ফেলার জন্য। এগিয়ে যাবেন কিছুটা- যেমন চলার অঙ্গ
তোলা আর পা ফেলা। বিমলদার হাতে বার্ধক্যের নিত্যসাথী একটি লাঠি। ঘাড়ে স্পন্ডেলেসিসের বেল্ট। ফেলে আ
দিনগুলির পশ্চাৎভূমি ধূসর। পিছনের প্রবীণ বৃক্ষটির পাতার ফাঁকে জমাট বাঁধছে আসন্ন রাত্রির অন্ধকার। সূর্য অস্ত যাচ্ছে,
পশ্চিম দিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত। বিমলদা চলেছেন নিশ্চিত লক্ষ্যে জীবনসূর্যের অস্তপথে। তলায় লেখা —

যখন পড়বে না মোর
পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইবো না, আমি বাইবো না মোর
খেয়াতরী এই ঘাটে।
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাকলে ...

অলস মুহূর্তে কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে চোখ চলে যায় আবার ছবির দিকে। তখন হারিয়ে যে
বিমলদাকে। দেখি তাঁর পরিবর্তে একই ভঙ্গীতে হেঁটে চলেছেন সাধনদা কিংবা সনৎবাবু, পেলব কিংবা দীপেশ। মনোজ অ
আমি কিংবা দীক্ষিত এ দৃশ্য আমার কল্পনা বিলাস নয়। অনিবার্য, প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর কাছে। অ
কোথাও অন্য কোনোখানে নয়।

জীবন বলে যেতে নাহি দিব। কী প্রাণান্তকর পরিশ্রমে, প্রচেষ্টায় দেহটা বেঁধে রাখতে চায় প্রাণকে। কিন্তু তবু যে
যায়। মৃত্যু যেই এসে দাঁড়াল শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি নিবিড় আলিঙ্গনে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ফেলে যাই
দেহটাকে।

কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ পাঠ করার পরে কেমন যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় হাহাকার করে ওঠে মনপ্রাণ। কি
গানের মুখরাটি অতিক্রম করে গভীরে প্রবেশ করলে এক মহৎ সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে চেতনায়। জগৎ প্রবাহে জীবন ও মৃ
মধ্যে ভেদরেখা নেই। এই দুইকে নিয়েই প্রবাহ। একটি না থাকলে অন্যটি অস্তিত্বহীন অর্থহীন হয়ে পড়তো। আসলে জীব
মৃত্যুর নিত্য রূপান্তরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে না পারাটাও সমস্যার মূল। এ কথার অর্থ এমনটা নয় যে জ্ঞানী
বোদ্ধারা সকলে মৃত্যু সচেতন আর হামিম শেখ, রামা কৈবর্তরা বোঝে না বলেই হাহাকার করে তা নয়। জীবন ও ম
সম্পর্কে, বেঁচে থাকতে চাওয়া বা না চাওয়া সম্পর্কে সকল মানুষের অবস্থানটা দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছা অনিচ্ছার নিরন্তর দ্বন্দ্বের ভি
দিয়েই চলতে হয়। জীবনে হতাশা আছে, ব্যর্থতা আছে। আছে শতশত জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তা। দুঃখের অন্ধকারে আ
পাই না। তখন হতাশা গ্রাস করে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। ঠিক সেই সময়ে প্রিয়জনদের পরিবেশের একটু আশ্বাস একটু মম
স্পর্শ জীবনতৃষ্ণার নিভন্ত শিখাটিকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি তখন দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলি; 'মরিতে চাহিনা আমি সু
ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

বেঁচে থাকার এই বাসনাটি অবয়বহীন নয়। নিত্যতায় তার প্রকাশ ঘটে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকাটা অবয়ব
চৈতন্য শূন্য। চৈতন্যহীন বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো আস্বাদ নেই। স্বাদ-গন্ধ স্পর্শহীন অস্তিত্ব নির্বাপিত আলোর থে
অন্ধকার। আসলে এই বেঁচে থাকটা অনুভব নয়, বোধে বেঁচে থাকা। বোধকে অনুভবে আনা অত্যন্ত অনুশীলন সাপেক্ষ এ
বিষয়। এই অনুশীলন সকলেই করতে পারি এবং নিরন্তর অনুশীলনের সোপান বেয়ে অনুভবের সর্বোচ্চ স্তরেও আ
পৌঁছোতে পারি। বলাবাহুল্য এটা গুহ্য, তান্ত্রিক সাধনাও নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন —

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু যেন এক অচেনা অজানা অদেখা ঘর। জীবন থেকে মৃত্যুর প্রাঙ্গণে যেতে

কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়।

কখনো তিনি বলছেন;

নাই তোর নাইরে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরেনা।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা
ভেসে এসে সাগরে মিশায়
এক একটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ
না জানি কবে তা হবে শেষ।

এই অনন্ত ভাঙা গড়া নিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অভিভাজ্যতা নিয়ে কতনা উপমা তিনি হাজির করেছেন। কোথাও বলছেন ওই যে পাকা আমটি মৃদু বাতাসের আঘাত সহ্য করতে না পেরে বৃন্তচ্যুত হল; ওই মুহূর্তটি বৃক্ষ ও ফলের কাছে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছেদ। অথচ সেই মুহূর্তটিই নবজন্মের প্রারম্ভ। কোথাও বা বলছেন সদ্যজাত শিশুর নাড়ী কাটার যে যন্ত্রণায় শিশুর আর্তনাদ সে কি বিচ্ছেদের না নবজন্মের পরমা ছন্দের সুতীব্র অভিভক্তি; ওই যে একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মৃত্তিকা থেকে, কোনোদিন আর ওই পদক্ষেপ ঘটবে না মাটির ঠিক ওই অংশটিতে আর কোনোদিন পড়বে না পদচিহ্ন, তবু ওখানে বিচ্ছেদ নেই আছে গতির পরমানন্দ।

মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অনুশীলন করেছেন বিশ্বের আর কোনো কবির সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। বিশ্ব দার্শনিক মহলেও রবীন্দ্র মৃত্যুদর্শন একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আমরা স্মরণে রাখব। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা হঠাৎ শেষ বয়সের বৌদ্ধিক অনুশীলন নয়। তাঁর গল্প-কবিতা উপন্যাস নাটক সঙ্গীত-প্রবন্ধ সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই দর্শন। এবং সেই দর্শনের একটি সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিকতা আছে। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন অথবা মৃত্যুদর্শন সয়ম্ভু কোনো বিষয় নয়। ভারতীয় লোকধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম মধ্যযুগের ইসলাম এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মদর্শন থেকে অনেক উপাদান নিয়ে পুষ্ট করেছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনটি।

ভারতবর্ষের ঋষিকবিরা বহপূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব তিনহাজার থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মৃত্যুর স্বরূপ সন্ধানের জন্য অনেক গভীরে এবং বহুমাত্রিকায় বিচার বিশ্লেষণ করবার আন্তরিক সাধনা করেছেন। ভাবলে পুলকিত হতে হয় মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে স্তর বিন্যাস করেছেন সেই স্তরের বর্বর যুগের শেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুকে বোধগম্য করবার প্রয়াস চালিয়েছেন ভারতের ঋষিকবিরা।

অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ বৃহদায়তন জীব সহ মানুষ সকলেই মৃত্যুকে ভয় পায়। মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। সকল প্রাণীপতঙ্গের এক কথা 'মরিতে চাহিনা আমি'। মানুষই কেবল যুক্ত করল নতুন দুটি শব্দ 'সুন্দর ভুবনে' 'সুন্দর ভুবন' চৈতন্যের ফসল। মৃত্যু শোক মর্মান্তিক। যে যায় সে চলে যায়। যারা থাকে, যারা আপনজন মৃত্যুশোক তাদের দগ্ধ করে জীবিত প্রাণের অবশিষ্ট রসটুকুও নিঃশেষে শুষে নেয়ে শোক। এই সব জীবন্মৃত মানুষ সমাজের অঙ্গী হতে পারে না সঙ্গী তো নয়ই। কেমন করে মানুষকে শোকমুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় - এই ভাবনা মানুষকে নিয়ে বসল। এই বিপন্মিক্তির সুতীব্র

বাসনাই মানুষকে নিরন্তর তাড়িত করেছে। কোনো বাধা বিপত্তিকে সে কখনো পাত্তোয়া করেনি। সন্তানহারা জননী কিংবা পুত্রহারা পিতা যেদিন এই বোধে উত্তীর্ণ হলো যে আমার সন্তান ছিলো, আছে এবং থাকবে এবং এখানে অথবা অন্য কোনোখানে সেদিনই সে ফিরে এলো জীবনে যুক্ত হলো সমাজ প্রবাহের সঙ্গে। আদিমযুগের মানুষের কাছে মৃত্যু সম্পর্কে এই 'বোধ' ছিল মহাসঞ্জীবনী।

মানুষের প্রশ্ন অনন্ত। মানুষ এইটুকু জেনে কিংবা পেয়েই থেমে যায়নি। তার জ্ঞানতৃষ্ণা অনন্ত পথের যাত্রী, প্রাণ কী। কোথা থেকে আসে কেন সে থাকে কোথায় বা যায় এই যাওয়া আসার পালা শেষ হবে কবে।

ঈশ উপনিষদের কবি জন্ম মৃত্যু সুখ-দুঃখ সব কিছুর উর্ধে উঠে বলেছেন ... ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ (এই পৃথিবী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) কোনো কিছুই স্থির অচঞ্চল নয়। সব কিছু পরিবর্তনশীল গতিময় বলেই এর নাম জগৎ) তাহলে এ জগতে কোনো কিছুই চিরন্তন নয়। জীবন আছে মৃত্যু এবং তাদের নিত্য রূপান্তর আছে পরিবর্তন আছে। কোনো কবি বলছেন মানবকুল শষ্যমের জায়তে ...'। শষ্য যেমন তার বাহ পরিপুষ্ট হলে নিজে মরে যায় মানুষও তেমনি মরণশীল কিন্তু সে বেঁচে থাকে শষ্যের মতো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। বৃহদারণ্যকের কবি যাজ্ঞবাল্ক বলছেন ঃ ইয়ং পৃথিবী সর্বেবাং ভূতা নাং মধ্বস্যৈ। পৃথিব্যে সর্বানি ভূতানি মধু .... এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই উভয় পুরুষই মধু। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম ইনিই অখিল বস্তু।

যাজ্ঞবাল্কের বক্তব্যের নিম্নরেখ অংশটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলছেন - যিনি আত্মা, তিনি অমৃত তাই তিনি ব্রহ্ম এবং অখিল বস্তুজগৎই ব্রহ্ম। প্রাণ ব্রহ্ম ও বস্তুর অবিভাজ্য ঐক্য কল্পনা করা হয়েছে, এখানে। অবশ্য আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার আধুনিক বিজ্ঞানের বস্তুভাবনা আর ঋষি কবিদের বস্তুভাবনা সমার্থক নয়। ঋষি কল্পনায় বস্তু চিরস্থায়ী ন য়, নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও বস্তুর অন্তরে বর্তমান এক অচঞ্চল স্থির সত্য তিনি নিত্যসত্য তিনিই ব্রহ্ম। এ জাতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে স্ববিরোধীতা আছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা অতিকল্পনা। তবু এইটে সত্য যে প্রাচীন ঋষি কবিদের কাছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের যে একটা নিবিড় ঐক্য আছে তা ধরা পড়েছিল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টি অনুসারে পদার্থের একটিমাত্র রূপ বা অবয়ব নেই। কঠিন, তরল বা প্লাজমারূপে যেমন তাকে পাওয়া যায় আমার অজৈব ও জৈব রূপেও পাওয়া যায়। অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। প্রাণসৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত অজৈব পদার্থের জৈবিকরণ। শুদ্ধ বালি দিয়ে প্রতিমা শিল্পী মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন না। মূর্তি, সৃষ্টির জন্য চাই পাথরবালি থেকে সৃষ্ট পলিমাটি। প্রকৃতিকেও নির্মাণ করে নিতে হয়েছে জৈব পদার্থের। কোটি কোটি বছরের শ্রম ও তিতিক্ষা তারপর চাপ ও তাপের উদ্ভাবনী কৌশলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ - প্রাণীদেহ নির্মাণের পলিমাটি। কী আছে এই জৈব যৌগগুলিতে। আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গঠিত নানা যৌগ ছাড়াও ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম আয়রণ, কপার জিঙ্ক কোবাল্টইত্যাদি। এদের মধ্যে কার্বণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তারপরেই স্থান প্রোটিনের। নানা জাতের অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি হয় প্রোটিন। আবার স্মরণ করব একটি পূর্ব কথা। জৈব পদার্থগুলি প্রাণের অপরিহার্য উপাদান কিন্তু তারা প্রাণ নয়। প্রকৃতি বহু সাধনায় প্রথম এইসব উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করেছে আদি প্রাণ প্রোক্যারিয়েট - সহজ ভাষায় আমরা বলি এককোষী অ্যামিবা। প্রোক্যারিয়েট থেকে আরও উন্নত এককোষী প্রাণী ইউক্যারিয়েট সৃষ্টি করতে প্রকৃতি সময় নিয়েছে প্রায় দেড়শো কোটি বছর।

তিনটি প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রাণকে অপ্রাণ থেকে পৃথক করেছে। প্রথম গুণ প্রাণ বাইরে থেকে বেঁচে থাকার উপকরণ (খাদ্য) গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় শক্তিটুকু রেখে বাকিটা বর্জন করতে পারে। দ্বিতীয় গুণ আত্মরক্ষা করার বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা আর তৃতীয় গুণ নিজের অনুরূপ একজনকে সৃষ্টি করার সুতীব্র বাসনা। প্রকৃতি এই তিনটি গুণ জীবকে কেন দিয়েছে সেটা আমরা বুঝি কিন্তু প্রাণ সৃষ্টি হলো কেমন করে এবং কী কৌশলে প্রকৃতি প্রাণের মধ্যে এই তিন গুণ প্রতিস্থাপন করলো সে তত্ত্ব এবং তথ্য আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞান নিশ্চয় সৃষ্টির আঁতুর ঘরের দরোজা একদিন খুঁজে পাবে।

হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস অনুসারে মৃত্যুর পর জীবদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবীও সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চভূত নিয়ে। মৃত্যুর পর মানবদেহের কঠিন অংশ প্রায় এক তৃতীয়াংশ - ক্ষিতি অর্থাৎ মাটিতে মিশে যায় অপ অর্থাৎ জলীয় অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) জলের সঙ্গে মিশে যায়। তেজ অর্থাৎ তাপ মরুৎ অর্থাৎ শরীরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের বায়ু এবং ব্যোম সবই ফিরে যায় পৃথিবীতে। এই বিশ্বাস বিজ্ঞান চেতনার খুবই কাছাকাছি। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর মৃত্যু তথা ধ্বংসের পূর্বে মানব শরীরের একটি কণারও পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। আমি এই মর্ত ভূমিতেই থাকব। আর আত্মাকে যদি 'চৈতন্য' বলে ধরে নি তাহলেও তাকে পৃথিবীর পদার্থের মধ্যেই থাকতে হবে। এঙ্গেলসের ভাষায় 'চৈতন্য হলো পদার্থের বিবর্তনের সর্বোচ্চ স্তর'। আমার চৈতন্য ছিল আগেও। কিন্তু পদার্থের নানা স্তরে। অগ্নিবলয়ের প্লাজমা স্তরে আমি ছিলাম। বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন শীতল, কঠিন পৃথিবীরূপী পদার্থের মধ্যে ছিলাম আমি। দেহরূপেও ছিলাম আমি। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকব।

যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করেছিলাম ফিরে আসি সেখানে। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গীত হয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্মরণ অনুষ্ঠান করবার সময়। এ গানের বাণী ও সুরের সঙ্গে মিশে আছে মৃত্যুর অব্যক্ত বেদনা একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রবল জীবন তৃষ্ণা। কবির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে হাট, বাট, ঘাট, নাট, লেনা, দেনা, আনাগোনা, খেয়াতরী ইত্যাদি কতকগুলি বাউল গানের সাংকেতিক শব্দের মাধ্যমে। এই সব শব্দগুলি এবং বিশেষভাবে 'আমি' শব্দটির নানা অর্থে ব্যবহারের মাধ্যমে কবি আমাদের টেনে নিয়ে যান এক সুগভীর তত্ত্বের প্রাঙ্গনে। গানের প্রথম স্তবকের 'আমি' আর শেষ স্তবকের 'আমি' এক নয় দুই আমি ভিন্ন সত্ত্বা। কোথায় তাদের ভিন্নতা! এই ভিন্নতা সৃষ্টি করি রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছেন! সনজীদা খাতুন তাঁর গবেষণা গ্রন্থ অথবা মাধুরীর ছন্দোবন্ধন' এ বিষয়টি নিয়ে সনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন; ''আমি বলতে যে ব্যক্তি সত্ত্বা তার লয় আছে কি? এইরকম একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠেছে এখানে। বাউলের উপলব্ধি এই যে, বিশ্বের প্রাণের বাটে চির আমির খেলা চলছে। আজকের এই আমি মিশে যায় চিরদিনের সেই 'আমিতে'। ''কাজেই চিরস্মৃত হয়ে থাকার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকুলতার কোনো অর্থ নেই। বাউল জানে সকল খিলাতেই যে মিশে থাকবে, কারণ, নানা রূপের লীলার মধ্যে দিয়েই এক 'আমি'র অনন্ত লীলা প্রবাহ চলছে''।

সনজীদা খাতুন সঠিকভাবেই দুই 'আমি' আমিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাদের স্বরূপও ব্যাখ্যা করেছেন। আর একটি প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কাকে লক্ষ্য করে এসব কথা বলেছেন? পৃথিবীকে না ধরার 'প্রতিবেশীকে? নাকি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার অভিযান থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য আপন চিত্তকেই পৌনঃপুনিকভাবে সতর্ক করা হল? শেষের ধারনাটিই সত্য বলে সন্দেহ হয়,'' এমন ধারণা কেউ করতেই পারেন। কেউ কেউ দ্বিতীয় 'আমি' কে হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্যের প্রকাশ ভেবেও তৃপ্তিবোধ করেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের দুই 'আমি'র তত্ত্বকে অন্যভাবে বুঝতে চাই। প্রথম 'আমি' বিশেষ রবীন্দ্রনাথ - তিনি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অষ্টম পুত্র, বাংলাভাষী কবি, নবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ১৯১৩ তে ইত্যাদি। দ্বিতীয় আমি রবীন্দ্রনাথের নির্বশেষ সত্ত্বা - তিনি চিরন্তন মানবাত্মা। চৈতন্যস্বরূপ; তিনি বাস করেন আত্মিক ভূমিতে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের বাসস্থান তিনটি। প্রথম বাসস্থান এই মর্তলোক। উত্তর মেরুর বরফের ঘরে, মরুভূমিতে, পর্বতশিখরে মানুষ বাস করে সর্বত্র। দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। সকল মানুষই মৃত্যুর পর কিছুকাল কিংবা বহুকাল স্মৃতিলোকে বাস করে। তাঁর তৃতীয় বাসস্থান আত্মিক লোক সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক।' তৃতীয় লোক বাস করে যে মানুষ তার নাম মানবাত্মা। মানবাত্মা হিন্দুধর্মের তথা দর্শনের জীবাত্মা নয় কোনো পরমাত্মারও অংশ নয়। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট সেই মহামানব নিষ্ঠুরতম মানুষের অন্তরেও আসা যাওয়া আছে। বাউলের ভাষায়ঃ

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত যোগী ঋষি চার যুগ ধরি রে
তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়

যে চাঁদ ধরতে পেলে হাতে কে পায়
তেমনি আলেক মানুষ আলেকে রয়
আছে আলেকে বসে।

লালনের ভাষায় সে মানুষ খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কখন আসে কখন যায়। অথবা

কে কথা কয়রে, দেখা দেয় না
নড় চড়ে হাতের কাছে
খুঁজিলে জনমভর মিলে না।
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ কী বিষম ভুলে ভ্রমি
আমি কোন জন সে কোন্ জনা

এই যে মনের মানুষ, সে মানুষ আছে এই মানুষের মধ্যেই। গুটি পোকা গুটি বেঁধে নিজেকে বন্দী করে রাখে প্রজাপতি হবে বলে। কিন্তু সময়মত গুটি কেটে বাহিরে আসতে না পারলে মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। পেরেও সে সব হারায়।

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লাগল বসে পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনিতে।

আমার অন্তরে, আমার পাশে সে মানুষ ডাক দিয়ে বলে দ্বার খোলো - বেরিয়ে এসো। ভোগসুখের গুটির মধ্যে আর কতকাল আবদ্ধ রাখবে। আমরা কেউ সে ডাক শুনে বাহিরে আসি কখনো বা নিদারুণ উপেক্ষায় বিদায় দি। 'মানুষ রতন' তবু অভিমান করে না প্রতীক্ষা করে নির্জনে নিভৃতে। ওই যে ইজরায়েলি বোমা বর্ষণে ছিন্নভিন্ন শিশুটিকে কোলে নিয়ে এক প্যালেস্তানি পিতা ছুটে চলেছে হাসপাতালে - কাকে সেই পিতাকে দেখে কে কেঁদে ওঠে আর্তরবে। তারই নাম মানুষ রতন। বেদনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আত্মিকলোকে অকস্মাৎ দুই পিতা এক হয়ে যায়।

মানুষের মতো এত স্বজাতি প্রিয় আর কোনো প্রানীরই নেই। এই প্রিয়ই তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, স্বতন্ত্র করেছে অন্য সকল প্রাণী থেকে। মানবপ্রেমেরই আর এক নাম আত্মলোক। ঋষি কবি বলেছেন ;

যস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মনিব অনুপস্যতি।
সর্বভূতেষু চ আত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।
যিনি সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন, নিজের
মধ্যে সকলকে অনুভব করেন তাঁর আর হারাবার
কিছু নেই। — ঈশ উপনিষদ - ৬